শতবর্ষে শিবকুমার

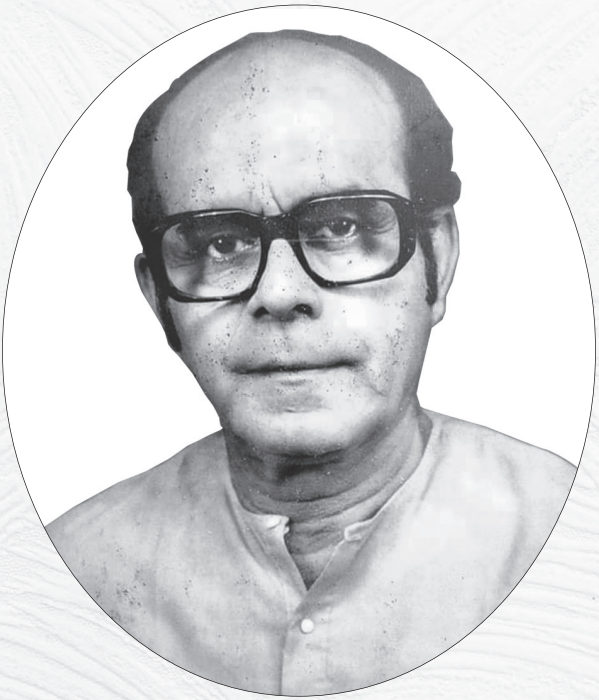

২.১০.১৯২১-১৫.৫.১৯৯৩

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে ‘হরপ্পা’-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ২ অক্টোবর ২০২১
রানাঘাট ঘরানার প্রথিতযশা সংগীতশিল্পী
শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শততম জন্মদিনে
প্রকাশিত হল ‘হরপ্পা’-র শ্রদ্ধার্ঘ্য

শতবর্ষে শিবকুমার

প্রচ্ছদ, ক্যালিগ্রাফি ও শিল্পনির্দেশনা

সোমনাথ ঘোষ

বিশেষ সহায়তা

সৌম্যদীপ

ব্যবহৃত আলোকচিত্র

শংকরনাথ ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত

সম্পাদক

সৈকত মুখার্জি

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

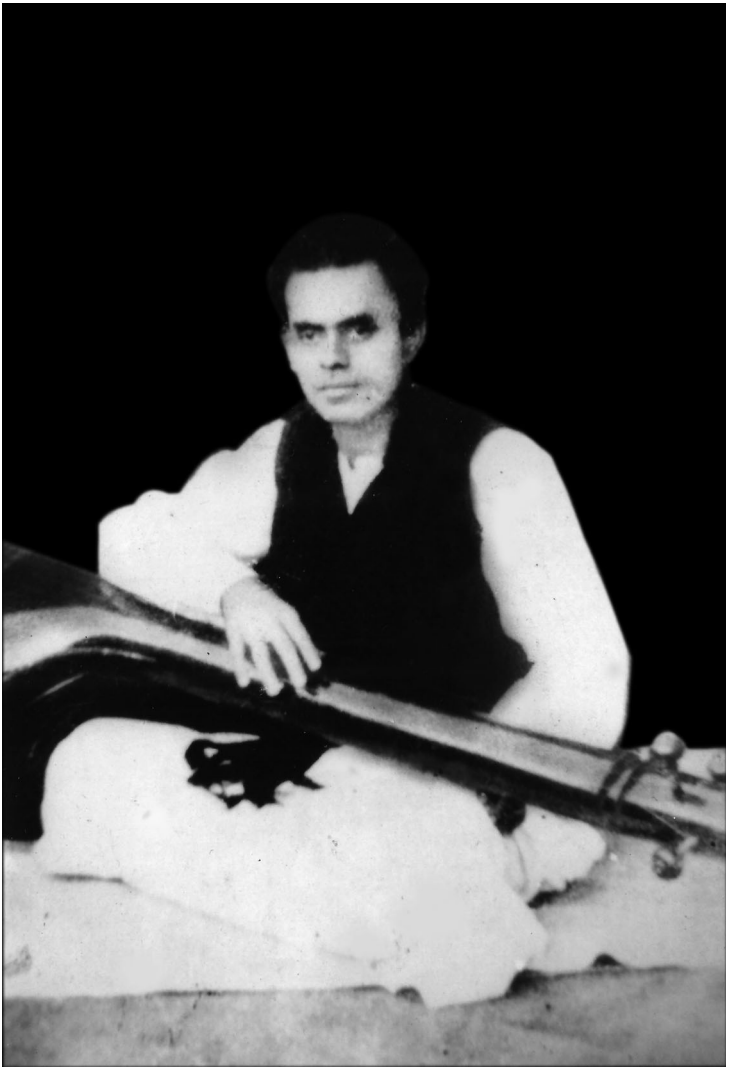

শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
২.১০.১৯২১-১৫.৫.১৯৯৩

শংকরনাথ ঘোষ

সংগীতশাস্ত্রী শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

দোসরা অক্টোবর—জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। ‘না শুধু মহাত্মার নয়, দিনটা দুরাত্মা গুলিন-এরও জন্মদিন’—রসিকতাটি স্বয়ং গুলিনদার—শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের।

সংগীতশাস্ত্রী শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর জন্ম ১৯২১ সালের দোসরা অক্টোবর। রানাঘাটে সে এক যুগ ছিল—গানের যুগ। শাস্ত্রীয় সংগীতে সুপারদর্শী পণ্ডিত উমানাথ কথকরত্নের পুত্র ‘রানাঘাট ঘরানা’-র পিতৃপুরুষ সংগীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং তাঁর শিষ্যবর্গ বিশেষত নগেন্দ্রনাথ

দত্ত, রানাঘাটের 'কোয়েল' নির্মল চট্টোপাধ্যায় (পদ্মবাবু), সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পিগণ রানাঘাটকে সুরের ঝর্ণাধারায় নিত্য রসসিক্ত করে রেখেছিলেন। রানাঘাটের আকাশে-বাতাসে তখন আলাপ-তান-মীড়-গমক-মূর্চ্ছনার সমারোহ-রাগরাগিণীর নিত্য আসা-যাওয়া। এমনই এক সময়ে শিবকুমারের জন্ম। কিন্তু তার আগে রানাঘাট ঘরানার কথা একটু বিশদে আলোচনা করা যাক—যদিও এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

রানাঘাটের কাছেই গাংনাপুর অঞ্চলে মালিপোতা গ্রাম। সেখানে এক পণ্ডিত বংশে পণ্ডিত গৌরীনাথ ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ সন্তান উমানাথ ভট্টাচার্য (১৮২৯-১৮৯৮)-এর জন্ম। উমানাথ ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। উমানাথ যখন নিতান্তই তরুণ তখন তাঁর কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে উত্তরবঙ্গের এক জমিদার তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান। পরবর্তী আট বছর জমিদার মশাই-এর প্রযত্নে উমানাথ বিভিন্ন গুরুর কাছে তালিম নিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীতে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। উমানাথের গুরুদের মধ্যে ছিলেন দিলওয়ার খাঁ, হস্যু খাঁ, বড়ে দুন্নী খাঁ-র মতো প্রখ্যাত শিল্পীরা। গুপ্তিপাড়ার অম্বিকাচরণ এবং শান্তিপুর-এর মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর কাছে টপ্পা গানের তালিম নিয়ে এই আঙ্গিকটিতে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেন তিনি। তারপর উমানাথ ফিরে আসেন স্বগ্রাম মালিপোতায় আর জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন কথকতাকে। রাগরাগিণীর প্রয়োগে গ্রাম্য কথকতাকে এক শিল্পে উন্নীত করেন উমানাথ কথকরত্ন। রানাঘাটের পালচৌধুরী জমিদারগণ ছিলেন উমানাথের এক বড়ো পৃষ্ঠপোষক।

উমানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৫৬-১৯৩৩) সংগীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শৈশব থেকেই পিতার সাহচর্যে বিভিন্ন আসরে বিশেষত পালচৌধুরী বাড়ির মহ্‌ফিলে হাজির হয়ে সংগীতরসে নিমজ্জিত থেকেই তাঁর বাল্য-কৈশোর অতিক্রান্ত। প্রথম শিক্ষাগুরু অবশ্যই পিতা উমানাথ। পরবর্তীকালে ওস্তাদ আহ্‌মদ খাঁ (ইনি পালচৌধুরী বাড়িতে প্রায়ই আসতেন এবং থেকে যেতেন), ইমামবাঁদী, বড়ে দুন্নী খাঁ, বদন খাঁ, বিশিষ্ট টপ্পা গায়ক পিতৃবন্ধু মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর কাছে তালিম নেন। পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট-এর কাছেও ধ্রুপদ-এর শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জনের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করলেও নগেন্দ্রনাথ আপন প্রতিভাবলে গানের এক নিজস্ব শৈলী গড়ে তোলেন। মালিপোতা ছেড়ে রানাঘাটে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-ই 'রানাঘাট ঘরানা'র আদি পুরুষ।

নগেন্দ্রনাথ কলকাতায় এবং অন্যত্র বহু আসরেই সংগীত পরিবেশন করলেও কখনও রানাঘাট ছাড়েননি। রানাঘাট ছেড়ে কলকাতায় থাকলে হয়তো নগেন্দ্রনাথ গায়ন-শিল্পী হিসাবে অনেক বেশি খ্যাতি অর্জন করতেন। কিন্তু তিনি বেঁচে রইলেন তাঁর শিষ্যদের মধ্য দিয়ে। তাঁর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে যাঁদের নাম অবশ্যই করতে হয় তাঁরা হলেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৮-১৯৪৮), নির্মল চট্টোপাধ্যায় (?-১৯৩৩)—যিনি 'পদ্মবাবু' নামেই পরিচিত, ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি 'হরবোলা হরিদাস' নামে খ্যাত হন, এবং অবশ্যই তাঁর দৌহিত্রী-পুত্র শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২১-১৯৯৩)।

‘পদ্মবাবু’ ছিলেন অত্যন্ত সুকণ্ঠের অধিকারী—রানাঘাটের ‘কোয়েল’ নামে পরিচিত। সংগীতকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। অনেক গল্প তাঁকে ঘিরে। এসব গল্পের সত্য মিথ্যা যাচাই করার উপায় আজ আর নেই। তবু দু-একটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। একদিন গভীর রাতে পদ্মবাবু তাঁর ছোটোবাজারের নিকটস্থ বাড়ির ছাদে পায়চারি করতে করতে আপন মনে উদাত্ত কণ্ঠে গান করছিলেন। মাঝরাতে রানাঘাট স্টেশনে কোনো একটি দূরগামী ট্রেন এসে থেমেছে। ট্রেনে যাচ্ছিলেন কোনো এক প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী। তিনি ট্রেন থেকে নেমে পায়চারি করছেন প্ল্যাটফর্মে। তখন ট্রেন থামত অনেকক্ষণ। নিশুতি নিস্তব্ধ রাতে তাঁর কানে পৌঁছল পদ্মবাবুর উদাত্ত কণ্ঠ। তিনি সুরের আবেগে মোহগ্রস্তের মতো স্টেশন থেকে বেরিয়ে সুরের উৎস লক্ষ্য করে এসে পৌঁছলেন পদ্মবাবুর বাড়ি। আর একবার পালচৌধুরী বাড়িতে কোনো বহিরাগত বিখ্যাত মহিলা শিল্পী এসেছেন গান গাইতে। পালচৌধুরী বাড়িতে সংগীতের মহ্‌ফিল বসত প্রায়ই। আর সেখানে রানাঘাটের সংগীতপ্রেমী শ্রোতারাও হাজির থাকতেন। সপার্ষদ পদ্মবাবুও সে আসরে হাজির শ্রোতা হিসেবেই। আসরের মাঝে মূল শিল্পী কিছুক্ষণের জন্য অন্দরে গেছেন সাময়িক বিরতি দিয়ে। আসর ফাঁকা যাচ্ছে। পদ্মবাবুর কোনো বন্ধু বললেন, “পদ্ম, আসর ফাঁকা যায় কেন? তুমিই কিছু ধরো না”। পদ্মবাবু ধরলেন সেই গানটাই যেটি সেদিনের শিল্পী একটু আগেই গেয়ে গেছেন। অন্দরে বিশ্রামরত শিল্পীর কানে গেছে সেই গান। তিনি বিস্মিত হয়ে বাইরে চলে এসেছেন। “কে গাইছে এই গান? এ তো আমাদের নিজস্ব ঘরের

বস্তু। আপনি এ গান কোথায় পেলেন?" পদ্মবাবু নির্বিকার কণ্ঠে বলেন, "আগে শিখিনি তো। আপনি যে এইমাত্র গেয়ে গেলেন। সেটাই গাওয়ার চেষ্টা করছিলাম"। শিল্পীসহ সকলেই বিস্ময়ে হতবাক! এমনই নাকি শ্রুতিধর ছিলেন পদ্মবাবু।

ভট্টাচার্য মশাই-এর আর এক দিকপাল শিষ্য ছিলেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত। আসর জমানো শিল্পী হিসাবে তাঁর যা খ্যাতি তার চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতি অর্জন করেন শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষক হিসাবে। দত্ত মশাইয়ের বহু ছাত্রই পরবর্তীকালে প্রভূত খ্যাতিমান শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কয়েকজনের নাম করি: বিজন বসু, বিভূতি দত্ত, শচীন দাস (মতিলাল), সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৭৭)। প্রসঙ্গত ভীষ্মদেবের প্রথম গুরু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং ভট্টাচার্য মশাইয়ের প্রয়াণের পর দত্তমশাই-এর কাছেও শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে লঘুসংগীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভীষ্মদেবকে নগেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে সমর্পণ করেন। ভীষ্মদেব বেশ কিছুদিন দত্ত মশাই-এর কাছে তালিম নেন। এই সময় বদল খাঁ সাহেব (১৮৩৪-১৯৩৭) বেশ কিছুদিন রানাঘাটে ছিলেন দত্তমশাই-এর কাছে। ভীষ্মদেবের গান শুনে বদল খাঁ সাহেব তাঁকে দত্তমশাই-এর কাছ থেকে নিয়ে যান। এরপর ভীষ্মদেব বদল খাঁর কাছে তালিম নেন। ভট্টাচার্য মশাই-এর দৌহিত্রী পুত্র শিবকুমার ও কর্তাদাদুর মৃত্যুর পর দত্ত-মশাই-এর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এমনই সুর নিমজ্জিত পরিমণ্ডলে জন্ম শিবকুমারের। পিতা রানাঘাটের বিশিষ্ট চিকিৎসক শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আদি নিবাস রানাঘাটের পার্শ্ববর্তী সুপ্রাচীন আনুলিয়া গ্রামে। মূলত ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামটি সুপ্রাচীন—এককালে অতি সমৃদ্ধ—জনপদ ছিল। পেশাগত কারণেই শৈলেন্দ্রনাথ মহকুমাশহর রানাঘাটে বসবাস করতে থাকেন। শিবকুমারের জন্মও রানাঘাটে। শিবকুমারের জননী সুলতা দেবী ভট্টাচার্য মশাই-এর দৌহিত্রী, দাদুর শিক্ষায় সংগীতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শিবকুমারের বড়দি লখনউ নিবাসী সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় (তারাদি)ও ভট্টাচার্য মশাই-এর কাছে গানের তালিম নেন এবং পরিচিত সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। (বর্তমান নিবেদকের দুটি দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল তারাদির গান শোনার: একটি 'চণ্ডীমণ্ডপ' (এই প্রতিষ্ঠানের কথা পরে আসবে)-এর আসরে আর একটি তাঁর পিতৃগৃহে। তখন তারাদি বার্ধক্যে উপনীত।)

শিবকুমার (গুলিনদা/ গুলিন/ গুলিনবাবু) বোধকরি সুর কণ্ঠে নিয়েই জন্মেছিলেন। সংগীতের প্রাথমিক শিক্ষা মা সুলতা দেবী আর বড়দি তারাদির কাছে। এবং অবশ্যই 'কর্তা দাদু' ভট্টাচার্য-মশাই-এর কোলে বসে। শিবকুমারের বয়স যখন মাত্র ১২ বছর তখন ভট্টাচার্য মশাই-এর দেহান্ত হয় (১৯৩৩ খ্রি)। তাঁর প্রয়াণের অল্পদিন আগে তাঁর প্রিয় শিষ্য রানাঘাটের 'কোয়েল' পদ্মবাবুর নিতান্ত অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। লোকে বলত ভট্টাচার্যমশাই শিষ্যের বিয়োগব্যথা সইতে না-পেরে শিষ্যের অনুগমন করেন।

এর মধ্যেই শিবকুমার ভর্তি হয়েছেন পালচৌধুরী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে। তখন বিদ্যালয়টি এই নামেই পরিচিত ছিল। বিদ্যালয়ে প্রবেশের কাল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ। ১৯৩৯-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বঙ্গবাসী কলেজ। গানের জগতে পুরোপুরি ঢুকে যাওয়ায় স্কুল-কলেজের পাঠ বেশিদূর এগোয়নি। এরই মধ্যে আন্তর্মহাবিদ্যালয় সংগীত প্রতিযোগিতায় শাস্ত্রীয় সংগীতের সব ক'টি বিভাগেই প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কর্তাদাদুর দেহান্তের পর শিবকুমার দীর্ঘদিন শিক্ষালাভ করেন কর্তাদাদুরই শিষ্য প্রখ্যাত সংগীত শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে। পরে মুর্শিদাবাদের সংগীত সাধক কাদের বক্স-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংগীত জগতের গভীরে প্রবেশ করার অবাধ অধিকার অর্জন করেন আপন প্রতিভায়। নিখুঁত রাগরূপায়ণের দক্ষতা ও অসাধারণ লয়বোধ ওস্তাদজিকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে তিনি অকৃপণ হাতে তাঁর সারা জীবনের সাংগীতিক সঞ্চয় তুলে দেন এই প্রতিভাবান শিষ্যের হাতে। আপন ঘরানা থেকে বিচ্যুত না-হয়েও শিবকুমার বিভিন্ন সূত্র থেকে রত্নরাজি আহরণ করে আপন ঘরানাকে সমৃদ্ধতর করে তোলেন। বিভিন্ন সময়ে রামপুর ঘরানা, ভাতখণ্ডে রীতি প্রভৃতি বিশেষ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে অনুশীলন করেন শিবকুমার। একেবারে পরিণত বয়সে গৌরীপুর-এর বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সান্নিধ্যে এসে আপন সঞ্চয়কে বাড়িয়ে তোলেন। এইভাবে নিজ ঘরানার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেও নিজস্ব এক গায়ন শৈলী গড়ে তোলেন।

শিবকুমার ছিলেন অত্যন্ত দৃপ্ত অথচ মধুর কণ্ঠসম্পদের অধিকারী। আর কী তার ব্যাপ্তি! এর সঙ্গে সহজাত সংগীত বোধ,

সংগীত প্রতিভা। ক্রমে শিবকুমার হয়ে উঠলেন খেয়াল, ঠুংরি, ভজন, টপ্পার অদ্বিতীয় শিল্পী। পাঞ্জাবি টপ্পা ও রানাঘাটের নিজস্ব আঙ্গিকে বাংলা টপ্পায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা রসিকজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সফল হয়েছিল। তাঁর কণ্ঠে নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) বলা যায় ইনি ছিলেন বাংলা টপ্পার জনক)-রচিত 'নিমিষের দেখা যদি পাই', 'ভ্রমরা কে তোমারে চায়', 'মন রাখা দেখা দিতে কে তোমারে বলেছিল' প্রভৃতি গান যাঁরা শুনেছেন, এসব গান তাঁদের স্মৃতিতে অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে। একটি ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করি। গুলিনদার গান হচ্ছে তরুণ সঙ্ঘে। টপ্পা, পুরাতনী ইত্যাদি বাংলা গানের আসর। বাইরের বারান্দায় বেঞ্চে বসে শুনছি। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। গুলিনদা তখন গাইছেন 'নিমিষের দেখা যদি পাই'—নিধুবাবুর টপ্পা। অত্যন্ত দরদ দিয়ে গাইছেন। আমরা আপ্লুত। নজরে পড়ল লাঠিহাতে টান টান চেহারার এক বৃদ্ধ রাস্তায় দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে গানটি শুনছেন। বৃদ্ধ অত্যন্ত পরিচিত—আমার পিতৃবন্ধু মুরারি চক্রবর্তী মশাই সংঘের সদস্য অনিল চক্রবর্তী (সুঁটু)-র পিতৃদেব। কাছে গিয়ে বললাম: "কাকা, বাইরে কেন? ভেতরে এসে বসুন"। এলেন, ভেতরে এসে বসলেন। গুলিনদাও গাইতে গাইতেই তাঁকে মাথা ঝুঁকিয়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে যেমন গাইছিলেন গাইতে লাগলেন। গানটি শেষ হল। সকলের বাহবা ধ্বনির মধ্যে চক্রবর্তী মশাই উঠে পড়লেন, বাড়ির দিকে যাবেন। এগিয়ে দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "কেমন শুনলেন?" উত্তর ছিল: "ভালোই গাইল গুলিন, কিন্তু বাবা, আমাদের পদ্মবাবুর মতো নয়"। আসলে পুরোনো সুখস্মৃতিকে ভুলে যাওয়া যায়

না। আমরাও বহন করে চলেছি গুলিনদার গানের স্মৃতি, তাঁর গন্ধর্ব নিন্দিত কণ্ঠ। আজও কি ভুলেছি খেয়াল গাইবার সময় তাঁর ওজস্বী কণ্ঠের প্রেক্ষাগৃহ-কাঁপানো হলক তান। আবার ওই দৃপ্ত কণ্ঠেই অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে যাওয়া মা মেনকার কন্যা-বিরহে কাতর আকুতি 'আমার উমা এল কই'—আমাদের আবেগ বিহ্বল করে তুলেছে, চোখে জল এনে দিয়েছে।

শিবকুমারের গানের সঞ্চয় ছিল বিপুল। এক দিকে খেয়াল, ঠুংরি, দাদরা, ভজন, টপ্পা-র বিপুল সঞ্চয় অপরদিকে রানাঘাটের নিজস্ব আংগিকে পুরাতনী, আগমনী-বিজয়া, শ্যামাসংগীত, নাটকের গান, বাঙলা টপ্পা, আখড়াই, হাফ আখড়াই, খেমটা প্রভৃতির সম্ভারও ছিল বিপুল। হাফ আখড়াই, খেমটা প্রভৃতি গানগুলি মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ জনেদের শোনাতেন। প্রাচীন অচলিত রাগরাগিণীর এক বিশাল সংগ্রহ ছিল তাঁর। এ বিষয়ে শোনা একটি গল্প—নিতান্তই শোনা, হলফ করা যাবে না—বলা যাক এ প্রসঙ্গে। 'চারুলতা' চলচ্চিত্রটি নির্মাণের সময় সত্যজিৎ রায় যিনি একাধারে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সংগীতের সবিশেষ রসজ্ঞ ছিলেন, গুলিনদার কাছে জানতে চান তাঁর প্রাচীন, বর্তমানে অচলিত, রাগরাগিণীর সঞ্চয়ের কথা। গুলিনদা প্রায় তিনশো রাগরাগিণীর এক তালিকা পেশ করে জানতে চান আর লাগবে কিনা। প্রসঙ্গত 'চারুলতা' চলচ্চিত্রে গুলিনদা নেপথ্যে একটা গান গেয়েছিলেন। আর একটি চলচ্চিত্রে গুলিনদা গান করেছিলেন—তরুণ মজুমদারের 'অমরগীতি'। নিধুবাবুর উপর আধারিত এই ছবিতে নিধুবাবুর গুরুর গানগুলি শিবকুমারের গাওয়া।

'সংগীতপ্রভাকর' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার বা আন্তর্মহাবিদ্যালয় সংগীত প্রতিযোগিতায় (যেটি নিয়মিত প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হত 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হল'-এ) বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানপ্রাপ্তি শিবকুমারের কাছে প্রায় ছেলেখেলার সামিল ছিল। অতি অল্পবয়সেই সংগীত প্রশিক্ষকের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে সংগীতকেই জীবনের সঙ্গে জীবিকার অবলম্বন করে তুললেন। সুদীর্ঘ শিক্ষক জীবনে, অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন উপাধি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভে সাহায্য করেছেন। এলাহাবাদের প্রয়াগ সংগীত সমিতি চণ্ডীগড়ের প্রবীণ কলাকেন্দ্র, সৌরভ, ইন্দিরা কলা বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষা পর্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন।

১৯৪৫-এ রানাঘাটে শিবকুমার তাঁর কর্তাদাদু (নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)-র নামে 'নগেন্দ্র সংগীত পরিষদ' নামে একটি সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৪৮-এ এই প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা গড়ে ওঠে কলকাতায়। শিবকুমারের প্রয়াণের পর রানাঘাটের প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত 'শিবকুমার সংগীত পরিষদ'-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে আজও চালু আছে, শিবকুমার শিষ্যা শর্মিলা বর্মন-এর পরিচালনায়।

পরীক্ষক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিচারক রূপে সারা ভারতের বিভিন্ন সংগীত কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করেছেন শিবকুমার। ১৯৪৭ থেকে শুরু করে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য শহরের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলন-এ অংশগ্রহণ করতে থাকেন নিয়মিত।

সারা ভারত সংগীত সম্মেলন, ভারতীয় সংগীত সম্মেলন, মধ্য কলকাতা সংগীত সম্মেলন, সুরেশ সংগীত সম্মেলন, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, তানসেন সংগীত সম্মেলন প্রভৃতি প্রধান সম্মেলনগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে অংশগ্রহণ করেছেন এবং রসিকসমাজের সবিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছেন। ১৯৪৭ থেকে আকাশবাণী এবং পরে দূরদর্শনেও বহু অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

শিবকুমারের প্রতিভার আর একটি ক্ষেত্র ছিল গীতরচনা ও সুরযোজনা। অসংখ্য রাগ ভিত্তিক সংগীত রচনা ছাড়াও প্রচলিত অনেক গানে সুরসংযোজনও তাঁর এক কীর্তি। নাট্যাভিনয়েও শিবকুমারের পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। 'বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস', 'ঔরংজেব' প্রভৃতি নাটকে তাঁর অভিনয় সে যুগে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। মনে হচ্ছে তাঁর শেষ মঞ্চাভিনয় ছিল রানাঘাট তরুণ সংঘের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে 'রক্তকরবী' নাটকে 'বিশু পাগলের' ভূমিকায়।

নিছক সংগীত-পরিবেশক-ই নন, সংগীতের তত্ত্ব, তার ইতিহাস ও দর্শন, বিভিন্ন ধরনের সংগীতের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ব্যাপারে গুলিনদার অধিগতি ছিল বিস্ময়কর। ঘনিষ্ঠজনের আড্ডায় কখনও কখনও তাঁর নিভৃত জ্ঞানভাণ্ডার ঈষৎ উন্মোচিত হত। সাধারণত এ সব ব্যাপারে সাধারণ্যে বক্তৃতা দেওয়া, আলোচনা করা ইত্যাদি ব্যাপারে অনীহাই ছিল। শুনেছি ১৯৭০-এ টপ্পার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার-এ শিবকুমারের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয়। আর একটি অনুষ্ঠানে রানাঘাট 'চিলড্রেন্স পার্ক'-এর দোতলায় একটি গীতালংকৃত আলোচনায় টপ্পা গান-এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক

অসাধারণ বক্তব্য পেশ করেছিলেন শিবকুমার। অনুষ্ঠানে তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করেন রানাঘাটের প্রবীণ তবলাশিল্পী ভোলানাথ ঘোষ মশাই-এর পুত্র সৌরেন্দ্র। আর একটি সভায় তাঁকে সংগীতালোচনা করতে শুনেছিলাম ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে। সে প্রসঙ্গে পরে আসব।

শিবকুমারের গুণগ্রাহীদের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁদের নাম করতে হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, তরুণ মজুমদার, হীরুবাবু, নাটুবাবু, শ্যামবাবু, ওস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ, ওস্তাদ দবীর খাঁ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, পাহাড়ী সান্যাল, উৎপল দত্ত প্রমুখ দিকপাল কলাবিদ ও কলারসিকবর্গ। শৈলজারঞ্জন প্রসঙ্গে শিবকুমার এক জায়গায় লিখেছিলেন, শৈলজারঞ্জন তাঁর গান শুনতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। শিবকুমারের ভগিনী ডক্টর অঞ্জলি মুখার্জি নজরুলগীতির এক প্রখ্যাত গায়িকা ছিলেন। অসংখ্য রেকর্ড ক্যাসেটে তার প্রমাণ রয়ে গেছে। তাঁর, কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডও ছিল। রেকর্ডগুলি হয়েছিল শৈলজারঞ্জনের তত্ত্বাবধানে। অঞ্জুদি যখন শৈলজারঞ্জনের কাছে তালিম নিতেন, শৈলজারঞ্জনের আগ্রহে গুলিনদাকেও সে আসরে হাজির থাকতে হত। শৈলজারঞ্জন তাঁর কাছে কলাবন্তী খেয়াল এবং শোরী মিঞা আর নিধুবাবুর টপ্পার বিভিন্ন বন্দিশ শুনতে চাইতেন। গুলিনদার আর এক গুণগ্রাহী ছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর। রবিশংকরের উদ্যোগে কলকাতার 'মর্মর প্রাসাদে' যে 'বাবু সংস্কৃতি সন্ধ্যা' অনুষ্ঠিত হয়, শিবকুমার সেই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনসহ বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। রবিশঙ্করের ভাবনা অনুসরণে শিবকুমার

রানাঘাটে গড়ে তুলতে চান এক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান—চণ্ডীমণ্ডপ। উদ্দেশ্য—রানাঘাট অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চর্চা এবং রানাঘাটের প্রাচীন ও বর্তমান নাগরিকদের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক সেতু রচনা। প্রথম কয়েক বছর চণ্ডীমণ্ডপের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্টজন অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি যাঁরা দীর্ঘদিন প্রবাসে আছেন তাঁদেরও কয়েকজন এ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বসবাসকারী সোহরাব হোসেন একবার এ অনুষ্ঠানে আসেন। নাটুবাবু, শ্যামবাবু, গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা আমন্ত্রিত হয়ে এ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। লখনউ-প্রবাসী সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় (তারাদি) একবার 'চণ্ডীমণ্ডপ'-এর অনুষ্ঠানে গান করেছিলেন। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতিতে তাঁর 'মানস সন্তান চণ্ডীমণ্ডপ' ছেড়ে চলে আসতে হয় শিবকুমারকে। এ ঘটনা তাঁর এবং আরও অনেক সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল।

সারা ভারতে বিভিন্ন সময়ে গান গেয়েছেন শিবকুমার। কিন্তু রানাঘাটকে কখনও অবহেলা করেননি তিনি। রানাঘাটে এখনও যে ক'জন মানুষ পুরোনো বেঁচেবর্তে আছেন তাঁরা স্মরণ করতে পারবেন রানাঘাট ভাসত সুরের জোয়ারে। আর সেই সুরের আবহে অসংখ্য ছোটো-বড়ো আসরে গান গাইতেন শিবকুমার—না, শিবকুমার নয়—গুলিনদা, আমাদের গুলিনদা, কখনও খেয়াল-ঠুংরি কখনও পুরাতনী, আগমনী, হোলি ইত্যাদি। পুজোর আগে গুলিনদার কয়েকটি আগমনী গানের আসর ছিল রানাঘাটের পুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মিলন সঙ্ঘে, তরুণ সঙ্ঘে, টাউন ক্লাবে, জ্ঞানানন্দ আশ্রমে অথবা কোনো প্রিয়জনের গৃহে।

এছাড়াও সারা বছরই নানাবিধ উপলক্ষ্যে নানান আসরে গান গাইতেন তিনি। চিলড্রেন্স পার্ক-এর দোতলায় আলোচনাসহ টপ্পা গানের আসরের কথা আগে বলেছি। আর একটা অনুষ্ঠান: ১৯৮৭-তে পালচৌধুরী বিদ্যালয়-এর ১৩৫-তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসবে একদিন রানাঘাটের আর এক সুসন্তান নাট্যকলাকোবিদ দেবনারায়ণ গুপ্তের সঙ্গে গুলিনদার যুগলবন্দি—দেবনারায়ণ গুপ্তের আলোচনার সঙ্গে গুলিনদার গাওয়া প্রাচীন বাংলা নাটকের গান। এক অসাধারণ নিবেদন। প্রসংগত, দুজনেই পালচৌধুরী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। আর একটি অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠান 'রানাঘাট কৃষ্টি অঙ্গন' (একটি অচিরস্থায়ী সংস্থা) আয়োজিত 'রানাঘাট ঘরানার গান'—রাগভিত্তিক বাংলা গানের আসর। ডক্টর তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্যসমৃদ্ধ মুখবন্ধ এবং আর একজন অনুজ শিল্পী—গুলিনদারই আত্মীয়—সুনীত চট্টোপাধ্যায়ের গীতপরিচিতিসহ গুলিনদা সংগীত পরিবেশন করেছিলেন রানাঘাটের এক শতাব্দীপ্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'হ্যাপী ক্লাব' গৃহে। গানগুলির মধ্যে নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রমুখ প্রখ্যাত গীতিকারদের গানের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং স্বয়ং শিবকুমার রচিত গানও ছিল।

আর এক অনুষ্ঠানে—কোন অনুষ্ঠান স্মরণে নেই—ঘটেছিল এক অসাধারণ ঘটনা। আমরা জানি রানাঘাটের পালচৌধুরী পরিবার ছিলেন সংগীত ও সংগীতশিল্পীদের বিশেষ অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক। একসময় ভারতের প্রখ্যাত শিল্পীরা পালচৌধুরী বাড়িতে সংগীত পরিবেশন করতে আসতেন। অনেক নামী শিল্পী বেশ কিছুদিন পালচৌধুরী বাড়িতে অতিথি রূপে অবস্থান

করতেন। বিখ্যাত গায়ক আহ্‌মদ খাঁ অনেকদিন পালচৌধুরী বাড়িতে ছিলেন। এমনটা হতে পারে পরিবারের কোনো সদস্য তাঁর কাছে তালিম নিচ্ছিলেন। শুধু পৃষ্ঠপোষণাই নয়, পরিবারের কেউ কেউ রীতিমত সংগীত চর্চা করতেন, তার প্রমাণ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভারতীয় সংগীতকোষ গ্রন্থে আছে। ক্ষীরোদ পালচৌধুরী মশাই একজন দক্ষ বেহালাবাদক ছিলেন—এ তো আমরাই দেখেছি, শুনেছি। এই আহ্‌মদ খাঁ সাহেব যাওয়ার সময় তাঁর তানপুরাটি পালচৌধুরী পরিবারকে দিয়ে যান। তানপুরাটি পালচৌধুরী বাড়িতেই ছিল। পালচৌধুরী পরিবারের এক সুসন্তান সুভদ্র অশোক পালচৌধুরী মশাই তানপুরাটি তুলে দেন শিবকুমারের সুযোগ্য হাতে। মুহূর্তটি স্মরণীয়।

১৯৯৩-এ ৯ মে রবিবার রবীন্দ্র-জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে রানাঘাট রবীন্দ্রভবনে শিবকুমারকে পাওয়া গেল এক নতুন ভূমিকায়। প্রতি বছর ওই বিশেষ দিনটি পালিত হত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। কোনো প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র-আলোচক রবীন্দ্রপ্রতিভার কোনো দিক নিয়ে আলোচনা করতেন, পরে সংগীত-আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানটি শেষ হত। এবারে শিবকুমারকে পাওয়া গেল এক বিশেষ ভূমিকায়। সেদিনের বক্তা হিসেবে তিনি 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান'—এ বিষয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত মনোগ্রাহী বক্তব্যটি নিবেদন করলেন। (ভাষণটি পরবর্তীকালে শিবকুমারের নির্দেশানুযায়ী মার্জিত রূপে প্রকাশিত হয় তাঁরই পূর্বতন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকায়। পরে ওই লেখাটিই পুনর্মুদ্রিত হয় ওই বিদ্যালয়ের সার্ধশতবর্ষ

উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রকাশিত 'স্মরণিকা'য়। লেখাটি গুলিনদার সাংগীতিক মননশীলতায় উজ্জ্বল। সেটি পুনর্মুদ্রিত হল এই পুস্তিকাটিতেও।)

ভাষণটির মাত্র কয়েকদিন পর রবিবার ১৬ মে ভোরবেলাই জানা গেল আগের দিন ১৫ মে রাত্রে আকস্মিক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আজীবন 'সুরের পূজারী' পাড়ি দিয়েছেন সুরলোকের পথে অনন্ত সুরের সন্ধানে।

শিবকুমার চলে গেলেন। স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই রইল না। স্মৃতি? সে তো যাঁরা তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন—তাঁর গান শুনেছেন—তাঁর কাছে গান শিখেছেন—তাঁর সঙ্গ করেছেন—তাঁদের স্মৃতি। পরবর্তী প্রজন্ম? আজকের কিশোর-তরুণ-যুবকের অনেকে তাঁর নাম পর্যন্ত শোনেনি। তাঁর প্রয়াণের পর ত্রিশ বছরও পার হয়নি। আর বছর দশেক পরে সম্পূর্ণ বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যাবেন গুলিনদা। গুলিনদার ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু কিছু এখনও এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছেন। সারা জীবন অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে গান শিখেছেন। (কিন্তু বলতে দুঃখ হয় তাঁর অসামান্য কৃতি রানাঘাট ঘরানার গৌরবময় ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো উত্তরসূরি পেলাম কই?) শুনেছি হুগলি (?) অঞ্চলের সোমেন ঘোষাল ওই অঞ্চলে সংগীতশিক্ষক হিসেবে সবিশেষ পরিচিত। গুলিনদার প্রথম যুগের ছাত্রী চিত্রা বসু শুনেছি শিল্পী হিসেবে নাম করেছিলেন। রেখা সরকার একসময় বহু অনুষ্ঠান করেছেন। গুলিনদার গোড়ার দিকের ছাত্র উপেন চন্দ্র, ভূপেন চন্দ্র বহুদিন দেহত্যাগ করেছেন। আরেক ছাত্র কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী

কালে কীর্তন কলানিধি রথীন ঘোষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তিনি পালাকীর্তনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শুনেছি উমানাথ কথকরত্নের উত্তরসূরি সুলতা দেবী এবং তাঁর পুত্র শিবকুমারও কীর্তনে পারদর্শী ছিলেন। এও শুনেছি সুলতা দেবী তাঁর কীর্তনের সম্পদ কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন।

শর্মিলা বর্মন 'নগেন্দ্র সংগীত পরিষদ' (এখন নগেন্দ্র শিবকুমার সংগীত পরিষদ)-এর দায়ভার কাঁধে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে আজও চলমান রেখেছেন। গুলিনদার নিজ পরিবারে পুত্রকন্যারা সংগীতকে আশ্রয় না-করলেও তাঁর দৌহিত্রী শিবপ্রিয়াকে তার দাদামশাই নিয়ম করে বোম্বাই (এখন মুম্বাই) গিয়ে তালিম দিয়ে আসতেন। শুনেছি তিনি এখনও দাদুর দেওয়া সংগীতকে ত্যাগ করেনি। কিন্তু বলতে দুঃখ হয় তাঁর অসামান্য কৃতি ও রানাঘাট ঘরানার গৌরবময় ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো উত্তরসূরি রইল না।

রসিকজনের কাছে শিবকুমারের প্রতিভা সমাদৃত হয়ে থাকলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই শিবকুমার সাধারণ্যে তেমন খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। প্রচারের আলো কখনওই তাঁর উপর তেমনভাবে পড়েনি যা তাঁর প্রাপ্য ছিল। কারণ বিশ্লেষণে যাব না। হয়তো তাঁর চারিত্রিক দার্ঢ্য যা তাঁকে সমঝোতা বিমুখ করেছিল—সেটাই কারণ।

কিন্তু আমাদের দুঃখ গুলিনদার গান যে প্রায় সমস্তই হারিয়ে গেল। সারাজীবনে একখানি মাত্র 'ই-পি' রেকর্ডে—চারখানি গান। তাও যথেষ্ট প্রচারিত নয়—অনেকেরই অজানা। কিছু কিছু গান হয়তো ক্যাসেটে ধরে রেখেছেন কোনো সংগীত ও

শিবকুমার অনুরাগী। বেতার ও দূরদর্শনের সংগ্রহশালায় কিছু কিছু গান ধরা থাকতে পারে—যদিও তার সম্ভাবনা খুবই কম। ক্যাসেট আর রেকর্ড তো পুরাতত্ত্বের আওতায় চলে গেল।

শেষ প্রশ্ন: রানাঘাটে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চার সঙ্গে 'রানাঘাট ঘরানার'ও কি ইতি হল?

প্রতিবেদকের নিবেদন/সাফাই: পালচৌধুরী বিদ্যালয়ের ১৯৯৬-৯৭-এর পত্রিকায় প্রয়াত শিবকুমারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যলিপি, ২০০৩-এ বিদ্যালয়ের সার্ধশতবর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত শিবকুমার লিখিত একটি প্রবন্ধের লেখক পরিচিতি এবং ২০১৪-তে রানাঘাট পৌরসভার সার্ধশতবর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকায় রানাঘাটের নাটক ও সংগীত বিষয়ক একটি নিবন্ধ আশ্রয় করে বর্তমান প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে। উল্লেখিত তিনটি রচনাই বর্তমান প্রতিবেদককৃত। এছাড়া বহুজনের কাছে শ্রুত নানাবিধ সত্য এবং কল্পিত গল্প, চরিতাভিধান ও ভারতীয় সংগীতকোষ প্রভৃতি কিছু পুস্তক ও রচনাটির নির্মাণে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

অনেক কথা বলা হল। কত কথা না-বলা হয়ে গেল। অনেক দিন ধরে গুলিনদার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। একটা সময়ে তো তপু (সমীর) চ্যাটার্জির বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে (এটিই ছিল 'কৃষ্টি অঙ্গন'-এর উৎস) সান্ধ্য আড্ডায় নিয়মিত হাজির থাকতেন—সংগীত আর নাটকের আলোচনায় (গোপালদা—গোপাল মল্লিকও সেই আড্ডায় থাকতেন যে) সন্ধে গড়িয়ে যেত। অন্তরঙ্গ গুলিনদাকে পাওয়া যেত সেই সময়ে। গান নিয়ে কত কথা। কখনও ইতিহাস—কখনও তত্ত্ব—কখনও

ভাব—কখনও দু-এক কলি গেয়ে শোনালেন—'চণ্ডীমণ্ডপ'-এর পরিকল্পনা আরও কত কী! আর একটি আড্ডা ছিল প্রভাতী, তরুণ সঙ্ঘের ঘরে—গৌর মুখার্জির চা সহযোগে ঘণ্টাখানেকের গুলতানি। একবার ভোটের আগে প্রচারে এলেন উৎপল দত্ত—আমাদেরই এক বন্ধুর বাড়ি উঠেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে হাজির ছিলাম। সকালবেলা দাবা খেলা চলছিল। উৎপলবাবু উঠে পড়লেন। বললেন "চলুন গুলিনবাবুর বাড়ি যাই। রানাঘাটে এলাম—একবার দেখা করে আসি"। অনেকের সঙ্গে আমিও ছিলাম। দুই দিকপালে কত আলোচনা। এমনই কত অভিজ্ঞতা।

না, আর নয়। বলতে থাকলে শেষ হবে না কথা। শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অনুরোধ গানের যে বিপুল ঐতিহ্য, তাকে ধরে রাখার তার প্রামাণিক ইতিহাস সংরক্ষণ করায় প্রয়াসী হোন। গল্পকথা—জনশ্রুতি নয়, সত্যকে আশ্রয় করে গড়ে উঠুক সে ইতিহাস।

অলমিতি।।

রানাঘটে দ্বারিকানাথ পালের বাড়িতে আগমনী গানের আসরে শিবকুমার

শি ব কু মা র চ ট্টো পা ধ্যা য়

রবীন্দ্রনাথ ও তার গান

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন একটা জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। প্রচুর প্রবন্ধ, প্রভূত বক্তৃতা এবং অজস্র গানে দেশবাসী রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেন প্রতি বৎসর প্রায় মাসাধিককাল ধরে। আজ এখানেও রবীন্দ্রভবন কমিটি তাঁদের সাধ্যানুসারে রবীন্দ্র বন্দনার আয়োজন করেছেন। অবশ্যই প্রশংসার কাজ। কিন্তু এই যে আমাকে—'ব্যাঘ্রঝম্পন' আপত্তি সত্ত্বেও টানতে টানতে একেবারে রবীন্দ্র জলধির কিনারায়

দাঁড় করিয়েই ক্ষান্ত হননি ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিয়েছেন—ফরমান হয়েছে আমাকে কিছু বলতে হবে, এটাকে খুব প্রশংসা করা যাচ্ছে না।

আমার আপত্তির মূল কারণটি নিবেদন করি। যে সারস্বত বোধি রবীন্দ্রসাগর মন্থনে কথঞ্চিৎ-ও সক্ষম যে অনুভূতি রবীন্দ্র দর্শনকে উপলব্ধি করতে পারে, যে বাক্‌কৌশল সেই অনন্ত-ব্যাপ্ত মহিমাকে বাচিক রূপদান করতে পারে—সে বোধি, সে অনুভূতি, সে রূপকারিতা আমার একেবারেই নেই। এ আমার বিনয় নয়, স্বীকৃতি। আমি বিনয়ী এমন সুনাম আমার মিত্ররাও দেয় না। আমি অকপটে স্বীকার করছি রবীন্দ্র বিষয়ে আমার মর্মিতা, অগ্রগামিতা বড়ই সীমিত, মন্থর। বহুমুখী রবীন্দ্র প্রতিভার যে দিকেই চাইনা কেন, তা আমার কাছে অতলান্ত। রবীন্দ্রনাথের কৃতির উপর আজও অসংখ্য বিদগ্ধ জন গবেষণা করে চলেছেন—চলতেও থাকবে তা বহুযুগ ধরে। 'তাঁকে' জানা আমাদের ফুরোবে না।

যদি দু এক কথা বলতেই হয়, আজ তাঁর গানের কথা একটু বলব। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর-গানকেই সবচেয়ে কালজয়ী হবে বলে মনে করতেন। তাঁর কথা—তাঁর সব সৃষ্টি যদি হারিয়েও যায় কোনদিন—সে দিনও থাকবে তার গান। গভীর তাৎপর্যময় উক্তি। তাঁর গান—তার ভাষা-সুর ছন্দ নান্দনিকতা দার্শনিকতা নিয়ে ভূমিকে স্বীকার করে ভূমার সন্ধানী, জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতা-দেশকালের সীমা অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় লোকের পথগামী। তাঁর গানে দেখি মানবের মেলা, প্রকৃতির লীলা, যা রূপবিমূর্ত দশা থেকে রূপবিমূর্ত জ্যোতিঃপুঞ্জে উত্তরণ ঘটায় যথার্থ অধিকারীর। রবীন্দ্রনাথের গান দূর থেকে শোনার বস্তু নয়;

তার উপলব্ধি ঘটে কেবল অনুশীলিত বুদ্ধিতে নয়, বোধির আত্মিক অনুভবে।

তাঁর গান কোথায় স্বতন্ত্র? কোথায় তার শ্রেষ্ঠত্ব? কোন গুণে সে দাবী জানায় দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যাওয়ার? এই জ্ঞানটুকুর জন্য প্রয়োজন আন্তরিক সাধনা, নিরন্তর তপস্যা, আচার্য নির্দেশিত সাংগীতিক ব্রতিত্ব। আমি বলতে চাইছি, রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যের ছান্দসিক রূপ রেখাকে ধরতে গেলে, তার প্রয়োগাত্মক রূপকে অনুভব করতে চাইলে, যথাযথ রূপায়ণের কৌশল আয়ত্ত করতে হলে, সুদীর্ঘ-সনিষ্ঠ-অনুশীলনের মাধ্যমেই তা অর্জন করতে হয়। আমরা কয়েক দশক আগে পর্যন্ত লক্ষ করেছি রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থী আচার্য নির্দেশিত পথে আবশ্যিক অনুশীলনের মাধ্যমে রবীন্দ্র-সংগীত-শিল্প-সাধনায় ব্রতী হতেন। পরিশীলিত হতেন, পরিমার্জিত হতেন আচর্য শিল্পের সঙ্গে একাত্মতায়, সনিষ্ঠ ভক্তিনম্রতায়। ফলে রবীন্দ্র-সংগীতের রূপনির্মাণে তাঁরা হয়ে উঠতেন সতর্ক, দায়িত্বশীল এবং নিষ্ঠাবান্। সাধনোত্তর কৌলীন্যের ঔদার্যে তাঁরা হয়ে উঠতেন সার্থক প্রচার-পরিব্রাজক। রবীন্দ্রসংগীতের সার্বিক মহিমময় স্বতন্ত্র রূপটির যথাযথ মূল্যায়ন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হত।

দুঃখের সঙ্গে অপ্রিয় সত্যকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে অর্বাচীনকালে হারমোনিয়ম আর স্বরলিপি সম্বল করে তাৎক্ষণিক নাম, যশ ও অর্থের কামনায় মঞ্চমুখী লোভাতুর ব্যক্তি ও দলের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তার সুনির্দিষ্ট, সুগঠিত রূপাবয়ব ক্লিষ্ট বিকৃত হচ্ছে। কোথায় গলদ কোথায় ফাঁকি কোথায়

মেকি—এদিকে যদি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এখনও দেওয়া না হয়, তবে আগতপ্রায় শতকে রবীন্দ্রসংগীত রোগগ্রস্ত অসুস্থ অপটু অবয়বে হাঁপিয়ে গুড়িয়ে চলতে বাধ্য হবে। রবীন্দ্রসংগীত এখন জনগণের কাছে পৌঁছে গেছে—তার প্রচার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি গালভরা কথার ঢক্‌কা নিনাদ ও চাকচিক্যময় চালচিত্র প্রদর্শন তো আত্মবঞ্চনা আর বিভ্রান্তিরচনা করে দেবতাকেই গ্রাস করে ফেলবে। ঈশ্বরেরই মৃত্যু ঘটলে তীর্থযাত্রায় কি ফল? কিন্তু এই নৈরাশ্যজনক আবহাওয়াতেও আজও যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত-আদর্শের নৈষ্ঠিক পতাকা তুলে ধরে চলেছেন, প্রাকৃতিক নিয়মে তাদের সংখ্যা সীমিত হয়ে এলেও আজও দু-চারজন প্রকৃত সাধক রয়েছেন—এটাই আমাদের ভরসার কথা।

রবীন্দ্রসংগীত ক্ষেত্রে গীত এবং গেয় বস্তুর বিশেষ বিশুদ্ধ বাচনিক রীতি, তার প্রয়োগে নান্দনিক ভাবনা, গীতিকাব্যের অনুভববেদ্যতা পরিমিতিবোধসম্পন্ন স্বচ্ছন্দ বিচরণের দক্ষতা—এ সবই অনুশীলন সাপেক্ষ, সাধনায় অর্জনীয়। এটা প্রতিপাদিত যে তাঁর গানের ভাষা ও সুর পরস্পরের পরিপূরক এক নির্ভেজাল নিটোল বস্তুতে পরিণত যা উৎসারিত প্লাবিত হয় শুধু কানে নয়—হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে।

আমার সুযোগ ঘটেছিল বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রসংগীত জগতের কিছু বিদগ্ধ মনীষী সাধকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোচনার। তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রসংগীতের তাত্ত্বিক বিষয়ে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ও ধীমান। অর্থাৎ এঁরা সকলেই রবীন্দ্রসংগীত ব্যাপারে রবীন্দ্র-দিনেন্দ্র ধারার বাহক। সর্বাগ্রে যাঁদের কথা বলতে হয় তাদের একজন হলেন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী, রবীন্দ্রস্নেহভাজন অগ্রজপৌত্র ৺সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরজন রবীন্দ্রসংগীতের নিষ্ঠাবান্ শিক্ষক, মহৎ প্রচারক, সুযন্ত্রী (এস্‌রাজ) শৈলজারঞ্জন মজুমদার। এঁরা ভারতীয় রাগসংগীতে পারংগম ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে পরিমিত অলঙ্কার, মীড় ও শ্রুতি কিভাবে ব্যবহার করতেন তার সুন্দর ব্যাখ্যা তাঁদের কাছে শুনেছি। রবীন্দ্রসংগীতের সুরের স্বাতন্ত্র্য, তার বৈশিষ্ট্য, তার অতুল মাধুর্য অনেকখানি নির্ভর করে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম শ্রুতির নিপুণ ব্যবহারে, যা হারমোনিয়মের সীমিত সংখ্যক রীডে বা স্বরলিপির বাঁধা ছকে ধরা পড়ে না, যা একান্তভাবে সিদ্ধগুরুর গায়নেই লভ্য। একথা রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের স্মরণে রাখতে অনুরোধ করি। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ হারমোনিয়াম যন্ত্রটি বিশেষ পছন্দ করতেন না। তানপুরা কিংবা ছড় দিয়ে বাজান হয় এমন যন্ত্র (এস্‌রাজ, দিলরুবা ইত্যাদি) বেশি পছন্দ করতেন।

প্রসঙ্গতঃ বলি, আমার প্রয়াতা ভগিনী ডঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় (যিনি নজরুলগীতির ক্ষেত্রে স্বমহিমায় বিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন) এক সময় শ্রদ্ধেয় শৈলজারঞ্জনের কাছে রবীন্দ্রসংগীতের তালিম নিতেন। (অনেকের হয়তো জানা নেই অঞ্জলি-গীত দু-একখানি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড সুধীজনের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। শৈলজারঞ্জনের আগ্রহে আমাকেও সেই শিক্ষার আসরে কখনও কখনও উপস্থিত থাকতে হত। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ লাভে আমারও আগ্রহ কিছু কম ছিল না। শৈলজারঞ্জন আমার কাছে কলাবন্তী খেয়াল এবং শোরী মিঞা আর নিধুবাবুর টপ্‌পার বিভিন্ন

বন্দিশ শুনতে চাইতেন। রবীন্দ্রনাথও নিধুবাবুর টপ্‌পা খুবই পছন্দ করতেন।

আরও কিছু মরমী গুণিজনের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়েছে। এঁরা সকলেই দৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুতির ওপর দাঁড়িয়ে ও রবীন্দ্রসংগীত রূপসুধা সাগরে অবগাহিত হয়েছেন এবং সার্থক পরিবেশনায় দরদী শ্রোতার চিত্ত রসে সিক্ত করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আর এক বিশেষ ভাবনা তার বাউলাঙ্গ গান। আউল, বাউল, সুফী, ফকির—প্রায় একই পরিবার ভুক্ত। এইসব সাধক সম্প্রদায়ের সাধনার মূলতত্ত্ব মানববাদ। মানুষই তাদের সাধনার কেন্দ্রে। বাউল গান বা মার্ফতি গান বা ফকিরি গান—তো শুধু গান নয়। এ গান তাদের সাধনার গুহ্য তত্ত্বের সাঙ্কেতিক প্রকাশ। বাউল গান তথা বাউল সাধনার তত্ত্ব রবীন্দ্র ভাবনার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আজ বাউল সাধনা ও তার তত্ত্ব নিয়ে গবেষণার হিড়িক পড়ে গেছে। লোক সংস্কৃতির নব-মূল্যায়ন হচ্ছে। এই সাধক সম্প্রদায় যখন সাধু সমাজে প্রায় অপরিজ্ঞাত, সেই তখন ১৯২৫ সালে কলকাতার সিনেট হলে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ Philosophy of our people নামে অভিভাষণ পাঠ করেন তা একান্তভাবে বাঙ্গলার নিরক্ষর বাউলদের কথা। পরে ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বজ্‌জন সভায় হিবার্ট বক্তৃতায় Religion of Man শীর্ষক যে ভাষণ দেন তার বিষয় ছিল ভারতের দীনহীন সন্ত বাউলদের মানব ধর্ম।

গুণী গবেষকগণ এই লোকগানের বয়সসীমা কমবেশি ৩৫০ বছর ধরলেও মানবপ্রেম ভিত্তিক এই ধর্ম সাধনার মূল

খুঁজে পাওয়া যাবে অতি প্রাচীনকালে। শুষ্ক যাগযজ্ঞ ভিত্তিক কর্মকাণ্ডসর্ব্বস্ব বেদেও দেখি বশিষ্ঠ দেবতাকে আপন সখা বলে ভাবছেন। এতো ধীরে ধীরে মরমী ভাবেরই অভ্যুত্থান। ঋষিরা যখন বলেন, আমার আমিই বিশ্বের সর্বশক্তির মূলে, তখন তার মধ্যেই কি বাউলতত্ত্বের শিকড় খুঁজে পাই না? পরবর্তীকালে উপনিষদের মধ্যেও বিশেষতঃ প্রধান উপনিষদগুলির অতিরিক্ত যে স্বল্প-প্রচলিত বহু উপনিষদ রয়েছে তার মধ্যে বিশেষকরে বাউল ভাবনার সমান ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায়।

বাউলরা বলেন তাঁদের তত্ত্ব সহজ নিত্য মানবধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই যতকাল মানুষ, ততকাল বাউলতত্ত্ব। বেদের আদি আছে। বাউলদের সহজ মত অনাদিকালের।

সেই অনাদিকাল থেকে শুরু করে বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, এমনকি বেদ বিরোধী বুদ্ধবাণীতেও সেই বাউলতত্ত্বের হদিশ পাই। বস্তুতঃ পরবর্তীকালে বুদ্ধ কথিত ধর্ম যখন বহু পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে তান্ত্রিকতার পথ ধরেছে, সে পথ এসে মিশে গেছে বাউলদের ক্রিয়াত্মক গোপন সাধনপদ্ধতিতে। অপরপক্ষে মরমী ইসলামী সাধকগণ যাঁরা শরিয়ৎকে অস্বীকার না করেও মরমী সূফীবাদের মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজেছেন—যে মতের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন পীরখাজা নিজামুদ্দিন চিস্তি (আউলিয়া)—তাঁরা তাঁদের সহমর্মী খুঁজে পেয়েছেন বাউল সাধকগণের মধ্যেই। আউল, বাউল, ফকির, মার্ফতি প্রভৃতি একাকার হয়ে এক লোকসাধনার ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে যার ব্যাপ্তি বিশাল। মানুষ এঁদের সাধনার কেন্দ্র। আপনাকে জেনে, আপনার মধ্যদিয়েই এঁরা সেই অজানাকে জানতে চান, অধরা কে ধরতে চান। রূপের

মধ্যেই এঁরা অরূপ-অপরূপের সন্ধান করেন। সেই সাধনার কথা সেই অনুসন্ধানের কথা, তাঁদের অনুভব উপলব্ধির কথা ছড়িয়ে আছে বাউলদের অসংখ্য গানে।

রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছড়িয়ে আছে বাউলতত্ত্ব ও বাউল সাধকদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার প্রভাব। বেদান্তের পুরুষ আর মরমী বাউলদের অধরা মনের মানুষ এক হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের একান্ত কাছের মানুষ আচার্যশ্রেষ্ঠ ক্ষিতিমোহনের কথা। মূলতঃ তাঁর গবেষণাই সনাতন লোকসাধনার ধারাটির মূল ও বৈচিত্র্য আধুনিক মানুষের অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তুলেছে। আজও বর্তমান রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ শিষ্য শান্তিনিকেতনে বাউল চর্চ্চার কর্ণধার রবীন্দ্রনাথের গানের একনিষ্ঠ প্রচারক শান্তিদেব ঘোষ।

বক্তব্য শেষ করি। গানের সাহায্যে যদি কোন কোন বক্তব্য পরিস্ফুট করা যেত, তাহলে হয়তো শ্রোতৃবর্গ তৃপ্ত হতেন। সম্ভব হয়নি। যে বিষয়ে আমার আজকের বাচালতা তা যদি দু-একজনের মনেও দাগ কাটে, চিন্তার খোরাক জোগায়, নিজেকে ধন্য মানব। নমস্কার—

১৯৯৩-এর ৯ মে রবিবার রবীন্দ্র-জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে রানাঘাট রবীন্দ্রভবনে শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত ভাষণের মার্জিত রূপ।